ইউনিট-২

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং আইন ও স্বাধীনতা
Rights and Duties of a Citizen, Law & Liberty

ভূমিকা

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মবিকাশের জন্যে মানুষের প্রয়োজন কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা। সাধারণভাবে এসব সুযোগ-সুবিধাকে আমরা অধিকার বলে থাকি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক নাগরিকেরই কতকগুলো অধিকার রয়েছে। আর এসব অধিকারের দাবিতেই মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে। আধুনিক রাষ্ট্রের মূল্যায়নও হয়ে থাকে নাগরিকদেরকে প্রদত্ত অধিকারের মাধমে। একটি গণতান্ত্রিক নাষ্ট্রে নাগরিকদের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি কর্তব্যও রয়েছে। অধিকার ভোগ করতে হলে একজন নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হবে। আর এ অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্যদিয়েই নাগরিক জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠে। নাগরিকের স্বাধীনতা ও সৃশৃঙ্খল জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে আইনের গুরুত্ব অপরিসীম। আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুসংহত করে।

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এবং আইন ও স্বাধীনতা শীর্ষক ইউনিটের আলোচনা নিম্নরূপ ৫টি পর্বে বিন্যস্ত হবেঃ

- *পাঠ-১ : নাগরিক অধিকার ও এর শ্রেণীবিভাগ*
- *পাঠ-২ : নাগরিকের কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক*
- *পাঠ-৩ : আইন*
- *পাঠ-৪ : স্বাধীনতা, এর রক্ষাকবচ এবং আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক*
- *পাঠ-৫ : সাম্য এবং সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক*

নাগরিক অধিকার ও এর শ্রেণীবিভাগ

পাঠ - ১

Rights of a Citizen and Its Classification

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অধিকারের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- নাগরিক অধিকারসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

অধিকারে সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ অধিকারের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রদার্শনিক টি এইচ গ্রীনের (T H Green) মতে, "অধিকার হচ্ছে সেসকল বাহ্যিক অবস্থা যা' মানসিক পরিপুষ্টি সাধন করে।" অধ্যাপক এইচ জে লাস্কির (H J Laski) মতে, "অধিকার হল সামাজিক জীবনের সেসকল শর্ত, যা' ছাড়া কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের সর্বোচ্চ বিকাশ সম্ভব নয়।" অধ্যাপক বার্কার (Prof. Barker) বলেছেন, "অধিকার হল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেসকল সুযোগ -সুবিধা যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।"

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, জনগণের ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য সমাজ তাদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দান করে এবং এ সকল সুযোগ-সুবিধার সমষ্টিই হল অধিকার। এ সকল সুযোগ-সুবিধা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় এবং এগুলোর লক্ষ্য সার্বজনীন কল্যাণ সাধন। তিনি আরও বলেন, "প্রত্যেক রাষ্ট্রই পরিচিতি লাভ করে এর প্রদত্ত অধিকার দ্বারা" (Every state is known by the rights that it maintains)।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক তিন ধরনের অধিকার ভোগ করে থাকে। যথা- সামাজিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার। নিচে আমরা এ তিন ধরনের নাগরিক অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করব।

সামাজিক অধিকার

সমাজে সুখী ও সুন্দরভাবে বসবাস করার জন্য নাগরিকগণ যেসকল অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে আমরা সামাজিক অধিকার বলি। সামাজিক অধিকারগুলো নিম্নরূপ :

■ **জীবন ধারণের অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার অধিকার থাকবে। এটি তার জন্মগত মৌলিক অধিকার। রাষ্ট্র নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সব রকম প্রচেষ্টা চালায়।

■ **ব্যক্তি স্বাধীতার অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকবে। রাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যেক নাগরিক অবাধে চলাফেরা করতে পারবে। বিনা বিচারে কোন নাগরিককে আটক রাখা যাবে না।

■ **মতামত প্রকাশের অধিকার :** মতামত প্রকাশের অধিকার গণতন্ত্রের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়। তাই প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিকদের এ অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে দেশের জন্যে ক্ষতিকর মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকদের দেয়া হয় না।

■ **সংবাদ পত্রের স্বাধীনতার অধিকার :** স্বাধীন ও নির্ভিকভাবে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করার অধিকারকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলে। সরকারি নীতি ও কাজের প্রকৃত ত্রুটিগুলো নাগরিকগণ স্বাধীনভাবে সমালোচনা করে রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধন করতে পারে। গণতন্ত্রের মূল অর্থ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শাসন পরিচালনা করা।

■ **সভা-সমিতির অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের সভা-সমিতির মাধ্যমে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকার থাকবে। কিন্তু এর মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থবিরোধী কোন তৎপরতা চালাতে দেয়া হয় না।

■ **সম্পত্তি ভোগের অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক স্বাধীনভাবে স্বীয় সম্পত্তি ভোগ করতে পারবে। নাগরিক তার নিজের সম্পত্তি বিক্রয় এবং অন্যের সম্পত্তি ক্রয় করতে পারবে।

■ **ধর্মীয় অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের স্বাধীনভাবে ধর্ম পালনের অধিকার থাকবে। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় কার্যকলাপ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে কোন বাধা-বিঘ্ন থাকবে না।

■ **আইনের অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক আইনের চোখে সমান অধিকার ভোগ করবে। এখানে কোন পক্ষপাতিত্ব থাকবে না।

■ **চুক্তির অধিকার :** আইনানুযায়ী একজন অন্যজনের সাথে যে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে। চুক্তি ভঙ্গকারীকে সমাজ ও রাষ্ট্র শাস্তি প্রদান করে থাকে।

■ **পরিবার গঠনের অধিকার :** পরিবার হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি। তাই পরিবার গঠনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিককে দেয়া হয়।

■ **স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লাভের অধিকার :** মানুষকে প্রকৃত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা অপরিহার্য। তাই গণশিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের প্রতি রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

রাজনৈতিক অধিকার

রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকগণ যেসব অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। রাজনৈতিক অধিকারগুলো নিুরূপ:

■ **ভোটাধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার রয়েছে। আর এ ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা রাষ্ট্রের অবশ্য কর্তব্য।

■ **প্রার্থী হবার অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের যোগ্যতা অনুযায়ী যে কোন পদে প্রার্থী হবার ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার রয়েছে।

■ **অভিযোগ পেশ করার অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের যে কোন অভাব-অভিযোগের কথা সরকারের নিকট পেশ করতে পারবে।

■ **বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার :** কোন নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে স্বীয় রাষ্ট্রের নিকট থেকে নিরাপত্তার জন্যে সাহায্য দাবি করতে পারে।

■ **চাকুরি লাভের অধিকার :** প্রত্যেক নাগরিকের নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অধীনে সরকারি চাকুরি লাভের অধিকার রয়েছে।

■ **স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার :** গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক দেশের যেকোন স্থানে নিজ ইচ্ছানুযায়ী বসবাস করতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকার

আর্থিক অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নাগরিকগণ যে সকল অধিকার ভোগ করে, সেগুলোকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

■ **কর্মের অধিকার :** কাজ করে খাওয়া সকল নাগরিকের অধিকার। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া ও কাজ করার ক্ষমতাকে কর্মের অধিকার বলে। এ অধিকার বলবৎ থাকার কারণে সরকারের উপর বেকার ভাতা দেবার কর্তব্য বর্তায়।

■ **ন্যায্য মজুরী লাভের অধিকার :** কর্মের অধিকার তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ন্যায্য মজুরী দেয়া হয়। মজুরী এমনভাবে দিতে হবে যেনো তা কাজের মান, দায়িত্ব ও পরিমাণের সংগে তা' সংগতিপূর্ণ হয়।

■ **অবকাশ লাভের অধিকার :** একটানা কাজ করার অর্থ কর্মের অধিকার ক্ষুণ্ন করা। কাজের সময়সীমা নির্ধারণ এবং কাজের শেষে অবকাশ-বিনোদনের ব্যবস্থা করাকে অবকাশ লাভের অধিকার বলে।

■ **শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার :** শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য কল-কারখানায় শ্রমিক সংঘ গঠনের অধিকার একটি স্বীকৃত অধিকার। এ অধিকারের বলে শ্রমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় এবং শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

সারকথাঃ

সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে আত্মবিকাশের জন্য মানুষের প্রয়োজন কতকগুলো সুযোগ সুবিধা। সাধারণভাবে এসকল সুযোগ-সুবিধাকে অধিকার বলা হয়। অন্যভাবে অধিকার বলতে বুঝায় এমন সব সুযোগ-সুবিধা যা দ্বারা ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে। মানুষ সমাজে কতটুকু অধিকার পায়, কতটুকু পাওয়া উচিত প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের মীমাংসার উপরই সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়ন নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই কতকগুলো অধিকার রয়েছে। সেসকল অধিকারের দাবিতে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। আধুনিক রাষ্ট্রের মূল্যায়ন নির্ধারিত হয়ে থাকে নাগরিকদের প্রদত্ত অধিকারের মাধ্যমে। সমাজ ও রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে তারা কতকগুলো অধিকার ভোগ করে যার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। সুতরাং অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. "অধিকার হলো মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সেসকল সুযোগ-সুবিধা যেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়।" অধিকারের এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন -
ক. লাস্কি
খ. বার্কার
গ. টি এইচ গ্রীন
ঘ. উপরের কেউই নন।

২. নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার কোন্‌টি?
ক. কর্মের অধিকার
খ. জীবনধারণের অধিকার
গ. চলাফেরা করার অধিকার
ঘ. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অধিকার।

৩. কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা কোন্‌ অধিকারের পরিপন্থী?
ক. জীবনধারণের অধিকার
খ. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার
গ. আইনগত অধিকার
ঘ. রাজনৈতিক অধিকার।

৪. কোন্‌টি সামাজিক অধিকার ?
ক. নিজের সম্পত্তি স্বাধীনভাবে ভোগ-দখলের অধিকার
খ. সরকারী চাকুরি লাভের অধিকার
গ. দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. অধিকারের সংজ্ঞা দিন
২. নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকারগুলো কি ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. নাগরিক অধিকারসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

সহায়ক গ্রন্থ

1. R N Gilchrist, Principles of Political Science, Bombay : Orient Longmans, 1962
2. J W Garner, Introduction to Political Science, NewYork : American Book Co., 1910

নাগরিকের কর্তব্য এবং অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

পাঠ-২

Duties of a Citizen and Relations between Rights and Duties

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাগরিকের কর্তব্য বলতে কি বুঝায় তা' বলতে পারবেন
- রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন, এবং
- অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নাগরিকের কর্তব্যসমূহ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিকের কর্তব্যগুলো নিম্নরূপ:

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা : প্রত্যেক নাগরিকের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা। আনুগত্য ছাড়া কেউ কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে না। রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা নাগরিকের দায়িত্ব।

আনুগত্য ছাড়া কেউ কোন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারে না।

আইন মান্য করা : রাষ্ট্রের আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। আইন না মানলে শান্ড়ি শৃংখলা বিঘ্নিত হয়। কাজেই প্রত্যেক নাগরিকের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ রাখার জন্যে আইন মেনে চলা অন্যতম নাগরিক কর্তব্য।

সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা : ভোটদান অন্যতম নাগরিক অধিকার। এ অধিকারকে সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার জন্য সুচিন্ড়িতভাবে ভোটদান করা নাগরিকের কর্তব্য। কারণ ভোটদানের নিষ্ঠার উপর শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভরশীল। আমরা যদি উওম ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করতে না পারি তাহলে অযোগ্য ও অথর্ব প্রতিনিধিদের দিয়ে উত্তম সরকার গঠন করা যাবে না। তাই দেশ ও জাতির স্বার্থে লোভ-লালসার উর্ধ্বে উঠে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে যোগ্য প্রার্থীদের ভোট দিতে হবে।

কর ও খাজনা প্রদান করা : রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর ও খাজনা যথারীতি প্রদান করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। তা না হলে অর্থাভাবে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারবে না।

রাষ্ট্রের সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা : রাষ্ট্রের গঠনমূলক ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। স্থানীয় সংস্থাগুলোতে প্রতিনিধিত্ব করা, জুরি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা এবং রাষ্ট্র যখন যে কাজ দেয় সে কাজ করা নাগরিকের কর্তব্য।

সন্তানদের সুশিক্ষিত করা : জাতিগঠন ও নাগরিক গুণাবলী বিকাশের জন্য সন্তানদের সুশিক্ষিত করা সকল নাগরিকের কর্তব্য। নেপোলিয়ান একবার তাঁর দেশের মায়েদের বলেছিলেন, "তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদেরকে উন্নত জাতি দান করব।"

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করা : বর্তমান বিশ্বে কোন রাষ্ট্রই আর বিচ্ছিন্ন নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির ফলে সকল রাষ্ট্রই আজ নিকট প্রতিবেশী। রাষ্ট্রের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক জোরদার হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে সকলের কর্তব্য হল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৃষি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অবদান ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করে বসবাস উপযোগী একটি সুন্দর বিশ্ব গড়ে তোলা।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিক যেমন তাদের অধিকার ভোগ করবে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে। অধিকার ভোগ করতে হলে দায়িত্ব অবশ্যই পালন করতে হবে। কেননা, অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত রয়েছে। মোট কথা, অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিকগণ রাষ্ট্রে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে।

অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সর্ম্পক বিদ্যমান। অধিকার ও কর্তব্যের প্রকৃতি, স্বরূপ এবং পরিধি বিশে- ষণ করলে দেখা যায় যে, এগুলো একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কর্তব্যবিহীন অধিকার বা

অধিকারবিহীন কর্তব্যের কথা কল্পনা করা যায় না। অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আমরা নিচের আলোচনা থেকে জানতে পারি:

উৎপত্তিগত সম্পর্ক : সমাজ থেকে আমরা যে অধিকার পাই তার বিনিময়ে সমাজের কল্যাণের জন্যে আমরা কর্তব্য পালন করি। কর্তব্য পালনের মধ্যে নিজের ও সমাজের মঙ্গল নিহিত। অধিকার সমাজ জীবনকে সজীব ও সচেতন করে, আর কর্তব্য সমাজ জীবনকে সুসংহত করে। যেমন- সমাজ আমাকে শিক্ষিত করে, বিনিময়ে আমি আমার শিক্ষাকে সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করি। সুতরাং বলা যায় অধিকার ও কর্তব্য সমাজ থেকে সৃষ্ট এবং সমাজের মধ্যেই বিকাশমান।

অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দু'টি দিক : অধিকার বলতে কর্তব্য এবং কর্তব্য বলতে অধিকারকে বুঝায় কারণ অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। সুতরাং প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার প্রকারান্ড়রে এক একটি নাগরিক কর্তব্য। সে জন্যে বলা হয়ে থাকে অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত। অধিকার বলতে আমরা সেসকল শর্তকে বুঝি যা'ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে অপরিহার্য। অধিকার বলতে যেমন কতকগুলো শর্তকে বুঝায় তেমনি সেসকল শর্ত সম্পাদনের দায়িত্বকেও বুঝায়। সুতরাং অধিকার উপভোগ করতে যেসকল কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয় তাদের সমষ্টিকে কর্তব্য বলে। যেমন- ভোটদানের অধিকার। ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বুঝায়। অতএব, আমরা বলতে পারি অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দু'টি দিক মাত্র। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি কল্পনা করা যায় না। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) যথার্থই বলেছেন, "অধিকার ও কর্তব্য একই বস্তুর দু'টি দিক।"

একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য : কারও অধিকার বলতে যেমন তার কর্তব্যকেও বুঝায় তেমনি একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বুঝায়। যেমন- আমার চলার অধিকার আছে, এর অর্থ অন্য কেউ আমার চলার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। যদি বলা হয় আমার বাঁচার অধিকার আছে, এর অর্থ কেউ আমার জীবনকে বিনাশ করতে পারবে না। অনুরূপভাবে আমার অধিকার আমার নিজের উপর কর্তব্য আরোপ করে। যেমন- আমার সম্পত্তির অধিকার আছে এর অর্থ অপরের সম্পত্তির উপর আমার কোন অধিকার নেই। সুতরাং অধিকার ও কর্তব্য পাশাপাশি অবস্থান করে। এদের বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করা যায় না।

অধিকারের পরিধি কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ : অধিকার অবাধ ও সীমাহীন হলে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হবে। যার ফলে সবল ব্যক্তি অধিকার ভোগ করবে, আর দুর্বল ব্যক্তি বঞ্চিত হবে। কাজেই একজনের অধিকার অন্য সকলের কর্তব্যবোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ করতে হবে।

অধিকার সংরক্ষণ ও কর্তব্য পালন : নাগরিকের যা' অধিকার রাষ্ট্রের নিকট তাই কর্তব্য এবং রাষ্ট্রের যা' অধিকার নাগরিকের নিকট তাই কর্তব্য। রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অধিকার আছে এবং রাষ্ট্র যখন সে অধিকার দাবি করে তখন নাগরিকের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্র যখন বিপদগ্রস্ড় হয় তখন নাগরিকদের জীবনের বিনিময়ে হলেও রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে হয়।

উপরি উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, অধিকার ও কর্তব্য ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। এদের একটি বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে নাগরিক কখনও অধিকার ও কর্তব্যকে পৃথক করে দেখতে পারে না। অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত থাকে। অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক। এরা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

সারকথা:
নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি কর্তব্যও আছে। আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে যেসকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে আমরা নাগরিক কর্তব্য বলে থাকি। কর্তব্য বলতে আমরা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের মংগলের জন্য কোন কিছু করা এবং না করাকে বুঝি। অধিকার ভোগ করতে হলে একজন নাগরিককে রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজন নাগরিকের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল তার রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সংহতি রক্ষার জন্যে সঠিক দায়িত্ব পালন করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. নগরিকের প্রধান কর্তব্য কোন্টি?
ক. রাজনীতি করা
খ. কর প্রদান করা
গ. রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা
ঘ. সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করা।

২. রাষ্ট্রকে শত্রুর হাত হতে রক্ষা করা কর্তব্য কাদের?
ক. সকল রাজনৈতিক দলের
খ. সেনাবাহিনীর
গ. সরকারের
ঘ. সকল নাগরিকের।

৩. নিয়মিত কর প্রদান করা কাদের কর্তব্য?
ক. শিল্পপতিদের
খ. নাগরিকের
গ. ব্যবসায়ীদের
ঘ. কৃষকের।

৪. অধিকার ও কর্তব্য কি?
ক. সামাজিকতা
খ. দায়িত্ব
গ. ভিন্ন দু'টি বস্তু
ঘ. একই বস্তুর দু'টি দিক মাত্র।

৫. অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্যে কিসের মংগল নিহিত?
ক. পরিবারের
খ. রাষ্ট্রের
গ. সমাজের
ঘ. দলীয় নেতাদের।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১.নাগরিকের কর্তব্য বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।
২. রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। খ ৪। ঘ ৫। গ

সহায়ক গ্রন্থ
1. R N Gilchrist, Principles of Political Science, Bombay : Orient Longmans, 1962
২. সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নিমাই প্রামাণিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলকাতা শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী,১৯৯১

পাঠ-৩

আইন
Law

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আইনের সংজ্ঞা দিতে পারবেন এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন
- আইনের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন
- আইনের উৎসসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন, এবং
- জনসাধারণ আইন মান্য করে কেন- তা' ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আইন কি

আইন ফার্সি শব্দ। ইংরেজি Law শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আইন। ইংরেজি Law শব্দটি টিউটনিক মূলশব্দ- Lag থেকে এসেছে। Lag শব্দের অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং শাব্দিক অর্থে আইন বলতে কতিপয় নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলীর সমষ্টিকে বুঝায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের অনুশাসনকে আইন বলে। যে সকল বিধিনিষেধ রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও যেগুলো ভঙ্গ করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুযায়ী সেগুলোকেই আইন বলে।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। এরিস্টটলের (Aristotle) মতে, "সমাজের যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হল আইন।" বিশে-ষণপন্থী জন অস্টিনের (Austin) মতে,"আইন হল নিম্নতনের প্রতি উর্ধ্বতন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আদেশ।" অধ্যাপক হেনরী মেইনের (Henry Maine) মতে, পরিবর্তনশীল, ক্রমোন্নতিমূলক, ক্রমবর্ধমান ও দীর্ঘকালীন সামাজিক প্রথার গতির ফলকে আইন বলা হয়।" অধ্যাপক হল্যান্ডের (Holland) মতে, "আইন হল মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের এমন কতকগুলো সাধারণ নিয়ম যা সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।"

আইনের সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বজনগ্রাহ্য ও চমৎকার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (Wilson)। তাঁর মতে, "আইন হল মানুষের স্থায়ী আচার-আচরণ ও চিন্তাধারার সেই অংশ যা' রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত বিধিতে পরিণত হয়েছে এবং যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট সমর্থন রয়েছে।"

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, আইন হল রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ও সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে অত্যাবশ্যক কতকগুলো বিধি-বিধানের সমষ্টি যা' রাষ্ট্রের সকলের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

আইনের বৈশিষ্ট্য

আইনের উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে আমারা আইনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। আইনের এ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. আইন হচ্ছে মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কিত বিধান

২. আইন শুধু মানুষের বাহ্যিক আচরণকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে

৩. সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসেবে সরকার আইন জারি করে থাকে

৪. আইন জারির প্রাথমিক উদ্যোগ সরকার স্বয়ং কিংবা সাধারণ জনগণও নিতে পারে

৫. আইন অবশ্য পালনীয়। আইন ভংগ বা অমান্য করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

আইনের শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক হল্যান্ড (Holland) আইনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন : ব্যক্তিগত আইন (Private Law) এবং সরকারি আইন (Public Law)। তার মতে, ব্যক্তিগত আইনে উভয় পক্ষই সাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু সরকারি আইনে অন্ততপক্ষে এক পক্ষ সরকার এবং অন্য পক্ষ সাধারণ ব্যক্তি।

তিনি সরকারি আইনকেও কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। প্রথমত, শাসনতান্ত্রিক আইন বা সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law) দ্বিতীয়ত, শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law) তৃতীয়ত, ফৌজদারি আইন (Criminal Law) চতুর্থত, ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত বিধি (Criminal Procedure) পঞ্চমত রাষ্ট্র সংক্রান্ড় আইন, যা' রাষ্ট্রকে আধা সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিচার করে (Law of the State in its quasi-private personality) এবং ষষ্ঠত, রাষ্ট্রীয় আইন সংক্রান্ত বিধি (Procedure of Law of the State)। আবার উৎপত্তির কেন্দ্রস্থল হতে বিচার করা হলে একে আমরা নিম্নোক্ত ছয় ভাগে ভাগ করে আলেচনা করতে পারি।

■ **শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) :** একে মৌলিক আইনও বলা হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা কিভাবে কোথায় অবস্থিত থাকে, দেশের শাসনব্যবস্থা কিভাবে চলবে তা' শাসনতান্ত্রিক আইন নিরূপন করে। আইন পরিষদ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন সীমা কতদূর, সাধারণ আইন কিভাবে প্রণীত হয়, তা' নির্ধারণ করে এ শাসনতান্ত্রিক আইন। এ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অত্যন্ত সাবধানতার সাথে জটিল প্রণালীতে সাধন করা হয়।

■ **সাধারণভাবে প্রণীত আইন (Statute):** এটি আইন পরিষদ কর্তৃক সাধারণভাবে প্রণীত আইন। সাধারণভাবে দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য আইন পরিষদ এ সকল আইন প্রণয়ন করে থাকে।

■ **সাধারণ আইন (Common Law)ঃ** এটা প্রথাভিত্তিক সাধারণ নিয়মাবলী। এটি বিভিন্ন বিচারালয়ে স্বীকৃত এবং অনুমোদিত। ন্যায়ানুগ মনোভাব এবং উপযোগিতাভিত্তিক এ সাধারণ নিয়মাবলী সামাজিক জীবনে অত্যন্ত মূল্যবান। ইংল্যান্ডে সাধারণ আইনসমূহ (Common Law) বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হতে গৃহীত হয়েছে।

■ **বিভাগীয় কর্তাদের আইন (Ordinance) :** এ আইন অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যে শাসন বিভাগীয় কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে এটি আইনের মর্যাদা লাভ করেছে।

■ **শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative Law):** সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনার জন্য খুঁটিনাটি নিয়ম-কানুনসমূহ শাসন বিভাগীয় আইন। রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রে প্রসারিত হবার সাথে সাথে এ সকল নিয়ম-কানুনের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যাচ্ছে। আইন পরিষদের এমন সময় বা সামর্থ্য নেই যে, তারা এসব বিষয়ে যথাযথ মনোনিবেশ করতে পারে। ফলে আইন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত কাঠামোকে ঠিক রেখে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ছোটখাট নিয়ম-কানুন তৈরি করেন।

■ **আন্তর্জাতিক আইন (International Law):** আন্তর্জাতিক আইন এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্র কিরূপ আচরণ করবে তা' নির্ধারণ করে।

আইনের উৎসসমূহ

আমরা জানি যে, আইন হল রাষ্ট্রের মত বহু বিবর্তনের ফল। আইনের বিভিন্ন উৎস রয়েছে। অধ্যাপক হল্যান্ড আইনের ছয়টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। নিচের আলোচনা থেকে আমরা তা' জানব।

■ **প্রচলিত প্রথা (Customs):** সকল দেশেই আইনের অন্যতম উৎস হচ্ছে সামাজিক রীতি-নীতি বা প্রচলিত প্রথা। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষের জীবনযাত্রা সামাজিক প্রথার দ্বারা পরিচালিত হত। সামাজিক প্রথা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে আইনে পরিণত হয়। বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন আইনের পরিপূরক হিসেবে প্রথাগত বিধানগুলোও আইনের মর্যাদা লাভ করে। ইংল্যান্ডের সাধারণ আইনগুলোও প্রচলিত-প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

■ **ধর্ম (Religion) :** আদি যুগে ধর্ম থেকেই অনেক আইনের সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় অনুশাসনও অনেক ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ নিজ আচরণ মেনে চলে। ধর্মের বিধি-বিধান রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করে আইনে পরিণত হতে পারে। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু প্রকার আইনের উৎস হচ্ছে ধর্ম। তাই বলা যায়, ধর্ম আইনের আরেকটি উৎস।

■ **বিজ্ঞানসম্মত ভাষ্য (Scientific Commentary):** বিশিষ্ট আইনবিদদের বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনাও আইনের অন্যতম উৎস। তাদের মতবাদ যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়। বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার স্বীকৃতিস্বরূপ একে বিচারকদের সিদ্ধান্ত বলেই গণ্য করা হয়।

■ **বিচারকের রায় (Adjudication) :** বিচার করতে গিয়ে অনেক সময় বিচারকগণ সমস্যায় পড়েন। কারণ প্রচলিত আইনকে হয়ত কোন কারণে ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। তখন তারা নিজস্ব বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আইন তৈরি করেন এবং বিচারের রায় দেন। ফলে নতুন আইন তৈরি হয়। পরবর্তীতে বিচারকগণ এ সকল নতুন আইন অনুসরণ করেন।

■ **ন্যায়বোধ (Equity) :** আইনের আর একটি উৎস হচ্ছে বিচারকগণের ন্যায়বোধ। বিচারকগণের কাছে অনেক সময় এমন মামলা উপস্থিত হয় যা' প্রচলিত আইনের দ্বারা বিচার করা চলে না। এ সকল ক্ষেত্রে বিচারকগণ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ন্যায়বোধের দ্বারা বিচার করে থাকেন। তাদের ন্যায়বোধ হতে যে সকল সিদ্ধান্ড় গড়ে উঠে তা' থেকে আইনের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

■ **আইন সভা (Legislature) :** সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ফলপ্রসূ উৎস হল আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণয়ন। বর্তমান বিশ্বে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন আইনের একটি বিরাট উৎস। আইনসভা পুরাতন আইনের সংশোধন করে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন আইন প্রণয়ন করে।

■ **জনমত (Public Opinion) :** আইনের উৎস হিসেবে জনমত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আইনসভার সদস্যগণ জনগণের প্রতিনিধি। জনমতের বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো তাদের অন্যতম দায়িত্ব। কাজেই আইনসভায় যে কোন আইন প্রণয়নের সময় জনমতের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। আইন বিশারদ ওপেনহেইম বলেন, "জনমত আইনের অন্যতম উৎস।"

■ **নির্বাহী ঘোষণা ও ডিক্রী (Declaration of the Executive and Decree) :** বর্তমান যুগে বিভিন্ন কারণে আইনসভা তার কর্তৃত্বকে শাসন বিভাগের মাধ্যমেও পরিচালিত করে। এ অবস্থায় শাসন বিভাগের জারিকৃত ঘোষণা ও আদেশগুলোও আইনে পরিণত হয়। তাই বলা যায় যে, প্রশাসনিক আইনের উৎস নির্বাহী ঘোষণা ও ডিক্রী।

■ **সংবিধান (Constitution) :** সংবিধান আইনের সবচেয়ে বড় উৎস। সংবিধান একটি বিশেষ দলিল। আইনসভা ও অন্যান্য সরকারি বিভাগের ক্ষমতা সীমিত ও তাদের কার্যরীতি প্রতিষ্ঠার জন্যে সংবিধান তৈরি করা হয়। সংবিধানে বিভিন্ন ধরনের বিধানাবলী লিপিবদ্ধ থাকে যেগুলো আইনসভা এবং সরকারের পথ-প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

জনসাধারণ আইন মান্য করে কেন?

নিম্নলিখিত কারণে জনসাধারণ আইন মেনে চলে :

■ **ধর্মীয় কারণে :** ধর্মীয় কারণে জনসাধারণ আইন মান্য করে। মধ্যযুগে আইন ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তখন আইন অমান্য করা পাপ বলে বিবেচিত হত। পাপের ভয়ে জনসাধারণ আইন মেনে চলত।

■ **সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে :** সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার কারণে জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে। আইন মান্য করে চললে রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং জনসাধারণ সুখ-শান্তি ও নিরাপদে বসবাস করতে পারে।

■ **শাস্তির ভয় :** শাস্তির ভয়ে জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে। আইন ভঙ্গ করা শাস্তিমূলক অপরাধ। আইন অমান্য করলে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি পেতে হয় এবং সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হতে হয়।

■ **ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য :** ন্যায় প্রতিষ্ঠার তাগিদে জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে। আইন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে। আইন না থাকলে অনিয়মে দেশ ছেয়ে যেত এবং মানব সভ্যতা বিলুপ্ত হত।

■ **মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য :** প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জনসাধারণের মৌলিক অধিকার রয়েছে। আইন না থাকলে এ সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয়। মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও ভোগের জন্যে জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে।

■ **মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে :** মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যে জনসাধারণ আইন মান্য করে চলে। সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তার অভাব হলে জনসাধারণ মানবিক গুণাবলী ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায় না। ফলে সভ্যতা, সমৃদ্ধি ও উন্নতি ব্যাহত হয়।

■ **উপযোগিতা উপলব্ধি :** আইনের উপযোগিতাও জনসাধারণের আইন মানতে অনুপ্রাণিত করে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে হলে কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে। এটি জনসাধারণ উপলব্ধি করে বলেই তারা আইন মেনে চলে।

লর্ড ব্রাইসের (Lord Bryce) মতে, জনসাধারণ পাঁচটি কারণে আইন মেনে চলে। যথা- ১. আলস্য ২. অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ৩. কাস্তির ভয়, ৪. সহানুভূতি ও ৫. বিচার-বুদ্ধি। যে দেশ যত বেশি উন্নত ও শিক্ষিত সে দেশের জনসাধারণ তত বেশি আইন মেনে চলে।

সারকথা:
মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজে আইনের প্রয়োজন হয়ে থাকে। যদি কোন আইন মানুষের অভ্যন্তরীণ কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাহলে সে আইনকে বলা হয় নৈতিক আইন। আর যদি মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে আলোচনা করে তবে তাকে বলা হয় সামাজিক বা রাজনৈতিক আইন। সমাজ জীবনে মানুষ সামাজিক ও রাজনৈতিক আইন মেনে চলে। আইন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুসংহত করে এবং সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের সুযোগ দান করে। আইন সার্বজনীন ও সর্বজন গ্রাহ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. ইংরেজি Law শব্দটি কোথা থেকে এসেছে?
   ক. Lawer শব্দটি থেকে
   খ. টিউটনিক Lag শব্দ থেকে
   গ. Administration থেকে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।
২. "The law is the command of the sovereign"- অর্থাৎ "আইন হল সার্বভৌমের আদেশ"-উক্তিটি কার?
   ক. হল্যান্ডের
   খ. অস্টিনের
   গ. হবস-এর
   ঘ. উড্রো উইলসনের।
৩. নিচের কোন্ বক্তব্যটি সঠিক?
   ক. আইন সমাজের স্বীকৃত নিয়ম
   খ. মানুষের মংগলের জন্য ব্যবহৃত বিধানকে আইন বলে
   গ. সমাজে প্রচলিত নিয়মকে আইন বলে
   ঘ. সমাজ ও রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও মানুষের মংগলের জন্য ব্যবহৃত বিধানের সমষ্টিই হল আইন।
৪. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইনের উৎস-
   ক. ৫টি
   খ. ৮টি
   গ. ৪টি
   ঘ. ৬টি।
৫. আইনের প্রধান উৎস কোন্টি?
   ক. শাসন বিভাগ
   খ. আইন পরিষদ
   গ. সরকার
   ঘ. আমলাতন্ত্র।
৬. জনসাধারণ আইন মেনে চলে কেন?
   ক. শাস্তির ভয়ে
   খ. ধর্মীয় কারণে
   গ. মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য
   ঘ. উপরের সবগুলো।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. আইনের সংজ্ঞা দিন।
২. আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
৩. আইন কত প্রকার ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. আইনের উৎসমূহ চিহ্নিত করুন।
২. জনসাধারণ আইন মেনে চলে কেন? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। ঘ ৫। খ ৬। ঘ

স্বাধীনতা, এর রক্ষাকবচ এবং আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

পাঠ - ৪

Liberty, Its Safeguards and Relations between Law and Liberty

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- স্বাধীনতার সজ্ঞা দিতে পারবেন
- স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করতে পারবেন
- স্বাধীনতার রক্ষাকবচসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্বাধীনতার সংজ্ঞা

সাধারণত অপরের কাজে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করে নিজের কাজ সম্পাদন করার অধিকারকে স্বাধীনতা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, স্বাধীনতা হল অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে স্বাধীনতার সংজ্ঞা প্রদান করেন। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বুঝায়, যদি উক্ত কাজ দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধার সৃষ্টি না হয়।" টি. এইচ. গ্রীণ (T H Green) বলেন, "যা উপভোগ করার এবং সম্পন্ন করার যোগ্য তা উপভোগ ও সম্পাদন করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলে।" অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সকল সামাজিক সুযোগ-সুবিধার উপর থেকে প্রতিবন্ধকতার অপসারণ যা' আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের জন্যে প্রয়োজনীয়।" তিনি আরো বলেন, "স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি সেই পরিবেশের সংরক্ষণ যেখানে মানুষ তার নিজ জীবনের চরম সার্থকতা লাভের সুযোগ পায়।"

স্বাধীনতা হল অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীনতা হল এমন একটি সামাজিক অবস্থা বা পরিবেশ যেখানে ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব এবং যেখানে ব্যক্তি প্রয়োজনীয় অধিকার ভোগ করতে পারে।

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ

সাধারণত স্বাধীনতাকে নিম্নলিখিত চার ভাগে ভাগ করে আমরা আলোচনা করতে পারি:

■ **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Private Liberty) :** ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলতে কোন ব্যক্তির যে সকল কাজকর্মকে বোঝায় যার প্রভাব সমাজের অন্যত্র গভীরভাবে পড়ে না। যেমন: ধর্মচর্চা, পরিবারিক গোপনীয়তা রক্ষা ইত্যাদি।

■ **সামাজিক স্বাধীনতা (Civil Liberty) :** সামাজিক স্বাধীনতা বলতে মানুষ সমাজ জীবনে যে সকল স্বাধীনতা ভোগ করে তাকে বোঝায়। জীবন রক্ষার অধিকার, ধনসম্পত্তি রক্ষার অধিকার, ধর্মের অধিকার, চলাফেরার অধিকার প্রভৃতিকে সামাজিক স্বাধীনতার পর্যায়ে আমরা ফেলতে পারি।

■ **রাজনৈতিক স্বাধীনতা (Political Liberty) :** রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে মানুষ যেসকল অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে। যেমন- ভোটদানের স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

■ **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty) :** জীবন ধারণের জন্যে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা পাওয়ার অধিকারকে আমরা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে পারি। যেমন- কাজ করা, ন্যায্য মজুরী পাওয়া, বেকার না থাকা ইত্যাদি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন, "অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ অভাব হতে মুক্তি।"

কেউ কেউ স্বাধীনতাকে আরও দুই শ্রেণীতে ভাগ করছেন। যেমন- প্রাকৃতিক ও জাতীয় স্বাধীনতা। নিজে থেকে মানুষ যে সকল অধিকার পায় তাকে প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) বলে। আর জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty) বলতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে বুঝায়।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ

স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো নিচে আলোচনা থেকে জানব।

■ **গণতন্ত্র (Democracy) :** স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ হল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক সরকার তাদের কার্যাবলীর জন্যে জনগণের কাছে দায়ী থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর এ সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভোট আধিক্যে সরকার গঠিত হয়। সুতরাং বলা হয় যে, গণতন্ত্র জনমতের সরকার। তাই সরকারকে জনগণের অধিকারের প্রতি যত্নশীল থাকতে হয়। ফলে এ ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় থাকে।

■ **আইন (Law) :** আইন স্বাধীনতার শর্ত ও রক্ষক। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয়। আইনবিহীন সমাজে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। রাষ্ট্রদার্শনিক লকের (Locke) মতে, "যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"

■ **মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights) :** সংবিধানে উল্লেখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ হলে তা' সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। ফলে সরকার কিংবা অন্য কোন কায়েমী স্বার্থবাদী মহল সেগুলো ভঙ্গ করতে পারে না।

■ **আইনের শাসন (Rule of Law) :** আইনের শাসন জনগণের স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে স্বীকৃত। আইনের শাসন বলতে আমরা বুঝি আইনের প্রাধান্য, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে বিনা বিচারের কাউকে আটক না করা। ব্যক্তি স্বাধীনতা আইনের শাসনের অন্যতম শর্ত। যে সমাজে আইনের শাসন কার্যকরী থাকে, স্বাধীনতা সেখানে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করে।

■ **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (Separation of Power) :** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের মাধ্যমে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। একই ব্যক্তি বা একই বিভাগের হাতে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না করে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ আবশ্যক। মন্টেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বর্ণনা করেছেন।

■ **ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization of Powers) :** ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা হলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। ফলে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা পায়।

■ **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of Judiciary) :** বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। বিচার বিভাগ আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচারকার্য সম্পন্ন করতে পারলে জনগণের স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

■ **দায়িত্বশীল সরকার (Responsible Government) :** দায়িত্বশীল সরকারকে স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ বলে আমরা বিবেচনা করতে পারি। এরূপ শাসনব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকারি দল ক্ষমতা হারাবার ভয়ে কখনই স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

■ **প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি (Direct Democratic System) :** গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচার প্রতিরোধ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি স্বাধীনতার জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

■ **সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা (Well-organized Party System) :** সুসংগঠিত দল ব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের কার্যাবলীর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে এবং জনস্বার্থ বিরোধী কাজের তীব্র সমালোচনা করে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করে।

■ **শোষণমুক্ত সামাজিক কাঠামো (Exploitation-free Social Structure) :** যে সমাজে সুযোগ-সুবিধা বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জনগণ ভোগ করে সেখানে স্বাধীনতা অর্থহীন। স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সামাজিক কাঠামোতে বিরাজমান ব্যাপক বৈষম্য দূর করে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

■ **সরকার ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক (Relations between Government and People) :** স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্যে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। জনগণের দ্বারা সরকার গঠিত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক না থাকলে স্বাধীনতা নস্যাৎ হয়ে যায়।

■ **জনগণের সতর্ক দৃষ্টি (Eternal Vigilance) :** জনগণের সতর্ক দৃষ্টি ছাড়া স্বাধীনতা রক্ষা হয় না। জনগণ যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না হয় তাহলে সরকার যে-কোন সময় জনগণের অধিকার খর্ব করবে, এর ফলে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "চিরন্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল, তাই জনগণের সতর্ক দৃষ্টিই স্বাধীনতা রক্ষার উপায়।"

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীনতা মানুষের চিরন্তন অধিকার। স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে প্রয়োজন আইন ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের। রাষ্ট্রীয় আইন বিভিন্নভাবে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। সুতরাং স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারকে যেমন তৎপর হতে হবে তেমনি নাগরিককে সচেতন হতে হবে।

আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আমরা নিচের আলোচনা থেকে বুঝতে পারব।

■ **আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি :** আইন ব্যক্তি স্বাধীনতাকে খর্ব না করে ব্যক্তির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। কারণ আইনের অবর্তমানে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে সকলেরই স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়। আইনের অনুপস্থিতিতে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করে। ফলে, দুর্বলের স্বাধীনতা সবল কর্তৃক অপহৃত হয়। যেখানে আইনের কর্তৃত্ব রয়েছে সেখানে সবল-দুর্বল প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তাই আমরা বলতে পারি, আইন স্বাধীনতার শর্ত ও ভিত্তি। এ প্রসেঙ্গ উইলোবী (Willoughby) বলেছেন, "নিয়ন্ত্রণ আছে বলেই স্বাধীনতার অস্তিত্ব আছে।"

■ **আইন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে :** আইন ব্যক্তিস্বাধীনতাকে খর্ব না করে একে রক্ষা করে। নাগরিকদের স্বাধীনতা যদি অপর কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হরণের উপক্রম হয় তখন নাগরিক আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে পারে। লোভী শাসকদের হাত থেকে আইনই নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করে।

■ **আইন স্বাধীনতার অভিভাবক :** আইন স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পিতামাতা যেমন সন্তানকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করেন, তেমনি আইন আপন শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতাকে নিরাপদ রাখার সকল ব্যবস্থা করে। যেমন-ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে স্বাধীনতা যখন বিঘ্নিত হয় আইনের নিয়ন্ত্রণের হস্ত তখন সুদৃঢ় হয়। এভাবে স্বাধীনতার অভিভাবক হিসেবে আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

■ **আইন স্বাধীনতার সহায়ক :** আইন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার সহায়তাকারী। যেখানে আইন অনুপস্থিত সেখানে স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা যায় না। দেশে আইনের প্রয়োগ যত বেশি হবে জনগণ স্বাধীনতাও তত বেশি ভোগ করতে পারবে। জনগণ যত বেশি স্বাধীনতা চাইবে, আইনের কর্তৃত্বও তাদের উপর তত বেশি বর্তাবে। এতে বুঝা যায়, আইনই স্বাধীনতার সহায়ক।

■ **আইন স্বাধীনতার ক্ষেত্র প্রসারিত করে :** আইনের উপস্থিতি স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। আইনের উপস্থিতিতে এমন এক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি হয় যেখানে সুন্দর ও সভ্য জীবনযাপনের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। রিচি (Ritchie) এজন্যই বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে যদি আত্মবিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বুঝায় তাহলে তা' নিশ্চিতভাবেই আইনের দ্বারা সৃষ্টি হয়।"

■ **আইন স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করে :** আইন স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করে। আইনের অবর্তমানে শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে গণ স্বাধীনতা আত্মসাৎ করে। আইনের সঠিক প্রয়োগ থাকলে শাসকগণ শাস্তি ভোগের ভয়ে স্বেচ্ছাচারী হন না। তাই বলা যায়, আইন নাগরিকদের জন্যে শোষণ বন্ধ করে স্বীয় স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ সৃষ্টি করে।

■ **আইন সামাজিক স্বাধীনতা রক্ষা করে :** সমাজে দুর্নীতি সৃষ্টি হয় তখনই যখন আইন কার্যকরী ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। সামাজিক দুর্নীতির কারণে সমাজের সকলের সামাজিক স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। একমাত্র আইনই সামাজিক দুর্নীতি দূরীভূত করে ব্যক্তির সামাজিক স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে।

■ **আইন সামাজিক শৃঙ্খখলা রক্ষা করে :** সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হলে জনগণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয়ে থাকে। সমাজের বিশৃঙ্খলা দূরীভূত করে জনগণের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হলে আইনের যথার্থ প্রয়োগ আবশ্যক। একমাত্র আইনই পারে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করে জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা করতে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। আইন যদি জনগণের মতানুযায়ী হয় এবং স্বাধীনতা বলতে যদি জনকল্যাণমূলক সুবিধা উপভোগ বুঝায় তাহলে এ দু'টি পরস্পরবিরোধী হতে পারে না বরং একে অপরের সহায়ক ও পরিপূরক। দার্শনিক রুশো (Rousseau) বলেন, "স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্যে আইন প্রয়োজনীয় অধিকার সকলের মধ্যে বন্টন করে দেয়।" তাই বলা হয়, আইন ও স্বাধীনতা যেন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

সারকথাঃ

কোন মানুষই পরাধীন থাকতে চায় না। স্বাধীনতা হচ্ছে তার সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। বর্তমানকালে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের স্বাধীনতা সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং শুধুমাত্র আইনে স্বাধীনতার কথা স্বীকার করলেই চলবে না, তাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে হবে। কোন সংগঠিত সমাজেই মানুষ স্বাধীন হতে পারে। সমাজবিহীন কোন অবস্থাতেই কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। অতএব, পৃথিবীর ইতিহাস হল স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার এবং স্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাস। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতা বলতে স্ব অধীনতা বা নিজের অধীনতাকে বুঝায়। অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত আচার-আচরণের সুযোগ-সুবিধাই হচ্ছে স্বাধীনতা। কিন্তু এ হল স্বেচ্ছাচারের নামান্তর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. "স্বাধীনতা বলতে খুশীমত কাজ করাকে বোঝায় যদি উক্ত কাজের দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে বাধার সৃষ্টি না হয়।" উক্তিটি কার?
   ক. হার্বাট স্পেনসার-এর
   খ. অধ্যাপক গার্নার-এর
   গ. টি. এইচ. গ্রীন-এর
   ঘ. অস্টিন-এর।

২. স্বাধীনতার শর্ত কোন্‌টি?
   ক. রাষ্ট্র
   খ. প্রশাসন
   গ. আইন
   ঘ. বিচার।

৩. নিচের কোন্‌টি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ?
   ক. সামরিক বাহিনী
   খ. সচিবালয়
   গ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
   ঘ. সরকার।

৪. "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"-উক্তিটি কে করেছেন ?
   ক. জন লক
   খ. লাস্কি
   গ. রুশো
   ঘ. হার্বার্ট স্পেনসার।

৫. স্বাধীনতাকে মোটামুটি কয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে?
   ক. দুই
   খ. তিন
   গ. চার
   ঘ. পাঁচ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. স্বাধীনতার সংজ্ঞা দিন।
২. রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কি বুঝেন?
৩. স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলো বর্ণনা করুন।
২. আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক ব্যখ্যা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। ক ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। গ

পাঠ - ৫

সাম্য ও স্বাধীনতা

Equality and Liberty

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ◆ সাম্যের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- ◆ সাম্যের বিভিন্ন রূপ চিহ্নিত করতে পারবেন
- ◆ সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন,
- ◆ সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সাম্যের সংজ্ঞা

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদগণ নানাভাবে সাম্যের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। অধ্যাপক লাস্কি (Laski) বলেন, "সাম্য অর্থ আচরণের সমতা নয়।" তিনি আরো বলেন, "সাম্য হল সেরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বিসর্জন দিতে হয় না।" তার মতে সাম্যের তিনটি বিশেষ দিক রয়েছে; যথা- (১) বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি (২) যথার্থ ও যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধাদির সৃষ্টি এবং (৩) বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সামগ্রী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সমভাবে বন্টন।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় যে, সাম্য বলতে আমরা মানব জীবনের সেই পরিবেশ বা প্রক্রিয়াকে বুঝি, যেখানে জাতি ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিককে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়।

সাম্যের বিভিন্ন রূপ

সাম্যের প্রকারভেদ নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। বার্কার (Ernest Barker) দু'ধরনের সাম্যের কথা বলেছেন। যথা : আইনগত সাম্য ও সামাজিক সাম্য। অধ্যাপক লাস্কি (H J Laski) বলেছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্যের কথা। তবে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ ছয় প্রকার সাম্যের কথা বলেছেন। নিচের আলোচনা থেকে আমরা এ সম্পর্কে জানতে পারি:

পৌরসাম্য (Civic Equality) : সকলের সমানভাবে পৌর অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করাকে পৌরসাম্য বলে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশগত প্রতিপত্তি প্রভৃতি, নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সকল ব্যক্তিগত অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেলেই পৌরসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার ভোগের সমান সুযোগ দেয়।

সামাজিক সাম্য (Social Equality) : সামাজিক সাম্যে সকলেই সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে যখন সকল মানুষকে সমান সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তখন তাকে সামাজিক সাম্য বলে। সামাজিক দৃষ্টিতে সকল অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠাই সামাজিক সাম্য।

রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality) : রাজনৈতিক সাম্য বলতে সকল নাগরিকের সমানভাবে ভোটদানের অধিকার, সরকারি চাকরিতে সমানভাবে নিয়োগের অধিকার এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে সমানভাবে অংশগ্রহণের অধিকারকে বুঝায়। এছাড়া স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার এবং সরকারের সমালোচনা করার অধিকারও রাজনৈতিক সাম্যের অন্তর্গত। নাবালক, দেউলিয়া, উন্মাদ ব্যতীত সকলে রাজনৈতিক অধিকারগুলো ভোগ করার সুযোগ পেলে রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক সাম্য গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শর্ত।

অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality) : অর্থনৈতিক সাম্য বলতে সকলের সমান অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি মালিকানা এবং সমাজের দুর্বল সম্প্রদায়কে রক্ষার বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। অর্থনৈতিক অসাম্য-বৈষম্য থাকলে সমাজে সম্পদশালী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। এ শ্রেণীই বিশেষ-সুযোগ সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করে। এর ফলে সাম্যের আদর্শ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অর্থনৈতিক সাম্য ব্যতীত রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য অর্থহীন।

আইনগত সাম্য (Legal Equality) : আইনের দৃষ্টিতে সাম্য বা সমানাধিকার স্বীকৃত হলে আইনগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। আইনের প্রয়োগ সকলের জন্য সমান, সমপর্যায়ে সাম্য, যুক্তি সঙ্গত খরচে বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি হল আইনগত সাম্যের মর্মকথা। আইনগত সাম্যে রাষ্ট্রের সকল

নাগরিক আইনগত সমান সুযোগ-সুবিধা ও অভিন্ন অধিকার ভোগ করতে পারবে। আইনের অনুশাসনের মধ্য দিয়েই আইনগত সাম্য মূর্ত হয়ে উঠে।

প্রাকৃতিক সাম্য (Natural Equality) : প্রাকৃতিক সাম্য বা স্বাভাবিক সাম্যের অর্থ জন্মগতভাবে সকল মানুষ সমান। ফরাসি দার্শনিক রুশোর লেখায় এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণায় প্রাকৃতিক সাম্যের আদর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরূপ সাম্যকে বর্তমানে খুব একটা গুরুত্ব দে'য়া হয় না। কারণ শক্তি-সামর্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে জন্মগত পার্থক্য রয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সাম্য একটি অখন্ড ধারণা। কিন্তু মানুষ তার ব্যক্তিত্বের পুর্ণ অভিব্যক্তি লাভের ক্ষেত্রকে বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারিত করায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সাম্যের ধারণাকে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করেছেন। উপরে বর্ণিত সাম্যের ছয়টি রূপ ছাড়াও কেউ কেউ সাম্যকে 'ব্যক্তিগত সাম্য' ও 'আন্তর্জাতিক সাম্য' রূপে বর্ণনা করেছেন।

সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব

সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচের আলোচনা থেকে সমাজ জীবনে সাম্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হব।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রের আরেক অর্থ-সামাজিক গণতন্ত্র। সামাজিক গণতন্ত্র বলতে বুঝায়, যেখানে মানুষে মানুষে, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিসেবে কোন ভেদাভেদ থাকে না। তাই দেখা যায়, সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষায় : সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাম্য ব্যক্তিস্বাধীনতার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। কারণ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকলে সবল ব্যক্তিরা দুর্বলদের উপর হস্তক্ষেপ করে। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষায় সাম্যের গুরুত্ব রয়েছে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় : অর্থনৈতিক সাম্য বিঘ্নিত হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়। সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্মের অধিকার এবং জীবনযাত্রার সর্ব নিম্মানের নিশ্চয়তা দিয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। সুতরাং ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষায় সাম্যের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে : সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্যও সাম্য গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে অসাম্য বিরাজ করলে শান্তি ব্যাহত হয়। কারণ অতি দরিদ্র মানুষেরা জীবিকা নির্বাহের তাগিদে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, খুনখারাবি প্রভৃতি সমাজবিরোধী কর্মকান্ড ঘটায়। তাই সমাজে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্যের প্রয়োজন।

আয় ও সম্পদের সমবন্টনে : সাম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের প্রভূত বৈষম্য বিরাজ করে। ফলে ধনী ও দরিদ্র এ দু'শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে। ধনীরা বিলাসবহুল জীবনযাপন করে এবং দরিদ্ররা দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করে। কিন্তু সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সকল সম্পদের ভোগ জনগণ সমানভাবে করতে পারে।

নৈতিক মান উন্নয়নে : সাম্যবাদী রাষ্ট্রে মানুষের অর্থ উপার্জনের স্বার্থপর প্রয়াস না থাকায় তাদের নৈতিক গুণাবলী উন্নত হয় বলে মনে করা হয়। ফলে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ তাদের চরিত্রের খারাপ দিকগুলো পরিত্যাগ করে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে : সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সাম্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সমাজে অসাম্য সৃষ্টি হলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ হ্রাস পায়। ফলে মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা হ্রাস পায়। মানুষের প্রতি মানুষের আস্থা ও ভালবাসা সৃষ্টিতে সাম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি যে, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বিশেষ করে ব্যক্তি ও সামাজিক স্বাধীনতা ভোগে সাম্যের অবদান কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। সমাজ জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সাম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই সাম্যভিত্তিক সমাজ সকলেরই কাম্য।

সাম্য ও স্বাধীনতার সম্পর্ক

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সাম্য ছাড়া স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকে না। আবার স্বাধীনতা না থাকলে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রচলিত আছে। একটি হচ্ছে, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর বিরোধী এবং অপরটি হচ্ছে, স্বাধীনতা ও সাম্য পরস্পর সম্পূরক। নিম্নে আমরা এ দু'টি মতবাদ ব্যাখ্যা করে সাম্য ও স্বাধীনতার পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করব।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর সম্পূরক : সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী নয় বরং সম্পূরক। এরা একে অপরের পথে কোনরূপ বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে না। সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা ভোগ করা যায় না। কেননা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকলে সবল দুর্বলের উপর হস্তক্ষেপ করে। এমতাবস্থায় দুর্বল স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান বলে বিবেচিত না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। অর্থনৈতিক সাম্য বিঘ্নিত হলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যর্থ হয়। তাই বলা যায়, সাম্য স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। আবার স্বাধীনতা না থাকলে মানুষে মানুষে ব্যবধান সৃষ্টি হয়। কাজেই সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশো (Rousseau) বলেন, "সাম্য ব্যতীত স্বাধীনতা অর্থহীন।" অধ্যাপক লাস্কি (H J Laski) এ মতের সমর্থন করে বলেন, "একটি রাষ্ট্রে যত সাম্য থাকবে, সে রাষ্ট্রে তত স্বাধীনতা থাকবে।" আর. এইচ. টনি (R H Tawney) এজন্যই বলেছেন, "স্বাধীনতা বলতে যদি মানবতার নিরবচ্ছিন্ন প্রসার বুঝায়, তাহলে এরূপ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কেবল সাম্যভিত্তিক সামাজে।" উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সাম্য স্বাধীনতার বিরোধী নয় বরং পরস্পর সম্পূরক।

সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী : সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী ও আপোসহীন। স্বাধীনতা মানুষকে নিজের ইচ্ছামত সবকিছু করার ক্ষমতা দেয়। কিন্তু সাম্য কাউকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পক্ষপাতী নয়। কাজেই দেখা যায়, একটি অপরটির স্বাভাবিক অপসারণ ঘটায়। সাম্যের ভাবাবেগ স্বাধীনতার আশাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড এ্যাক্টন (Lord Acton) এবং ডি. টকভিল (De Tocqueville) এর মতে, "সাম্য ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।" লর্ড এ্যক্টন আরো বলেন, "সাম্যের আকা খা স্বাধীনতার আশা ব্যর্থ করে দেয়।" অবশ্য এ ধরনের মতবাদ মূলত অর্থনৈতিক সাম্যের দিকেই ইঙ্গিত করেছে। তারা উৎপাদন, বিনিময় ও বন্টন ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের মতে, সাম্যনীতি অনুসরণ করতে হলে বিত্তশালী বা সম্পদশালীর বিত্ত বা সম্পদের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া উচিত। কেননা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণহীন অবাধ স্বাধীনতার কোন স্থান নেই। প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা বলতে মানুষের এরূপ কাজ করার ক্ষমতাকে বুঝায় যার দ্বারা অন্যের অনুরূপ কাজে হস্তক্ষেপ না হয়। সাম্য না থাকলে স্বাধীনতা হয় অবাধ। ফলে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম হয়। তাই সাম্য ও স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীনতাকে পুরোপুরি ভোগ করতে হলে সাম্য একান্ত আবশ্যক। আবার সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য। কাজেই দেখা যায়, উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু বিরোধ থাকলেও উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই সাম্যের আদর্শে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করা যাবে।

সারকথাঃ

গণতন্ত্রের ভিত্তিই হচ্ছে সাম্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নীতিগতভাবে স্বীকার করা হয় যে সকল মানুষই সমান। সাম্য ও স্বাধীনতা ব্যতীত গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করা যায় না। তাই গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় স্বাধীনতার ধারণাকে বাস্তবে রূপদান করতে হলে সাম্যনীতির সফল প্রয়োগ অনস্বীকার্য। সাধারণ অর্থে সাম্য বলতে সকল মানুষ সমান এ ধারণাকেই বুঝায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, শারীরিক ও মানসিক গঠনের দিক থেকে কিংবা আর্থিক ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে সব মানুষ সমান নয়। প্রত্যেকের ক্ষমতা ও প্রবণতা, দক্ষতা এবং যোগ্যতা ভিন্ন রকমের। এ পার্থক্য আছে বলেই সকল মানুষ সমাজের নিকট থেকে সমান ব্যবহার ও মর্যাদা দাবি করতে পারে না। তবু সাম্যের জয়গানে চারদিক মুখর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে সকল মানুষকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং তাদের সুপ্ত গুণাবলী বিকাশের পথকে সহজতর করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. সাম্যের অর্থ কি?

ক. সকলকে এক সমান করা

খ. সমান আর্থিক সুযোগ দেয়া

গ. সমান করার প্রক্রিয়া

ঘ. সমান সুযোগ-সুবিধা দেয়া।

২. "সাম্য হল সেরূপ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অন্যের সুবিধার জন্য বিসর্জন দিতে না হয়।"-উক্তিটি কার?

ক. উইলসনের

খ. অধ্যাপক গার্নারের

গ. লাস্কির

ঘ. হার্বার্টের।

৩. আইনগত সাম্য কাকে বলে?

ক. বিনা বিচারে আটক রাখাকে

খ. বিনা বিচারে আটক না রাখাকে

গ. বিনা অপরাধে গ্রেফতার করাকে

ঘ. বিনা অপরাধে গ্রেফতার ও বিনা বিচারে আটক না রাখার ব্যবস্থাকে।

৪. স্বাধীনতা ও সাম্যের সম্পর্ক কেমন?

ক. ঘনিষ্ট

খ. পরস্পর বিরোধী

গ. বিরোধ ও ঘনিষ্ঠ উভয়ই

ঘ. তিক্ত।

৫. কিসের উপর স্বাধীনতার মূল নিহিত?

ক. সমাজের উপর

খ. রাষ্ট্রের উপর

গ. স্বাধীনতার উপর

ঘ. সাম্যের উপর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সাম্যের সংজ্ঞা দিন।

২. সাম্য কত প্রকার ও কি কি বলুন।

৩। রাজনৈতিক সাম্য বলতে কি বুঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সমাজ জীবনে সাম্যের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

২। "সাম্যই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাই সাম্য।"- কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ